আমেরিকা: স্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্ন

আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতন এবং বৈশ্বিক জিহাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

আমেরিকা: স্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্ন

আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতন এবং বৈশ্বিক জিহাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

সূচিপত্র

পূর্ব কথা

সম্মানিত উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ’ র এই গুরুত্বপূর্ণ লেখাটির উর্দু সংস্করণ জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন “নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দ” এর নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০ ইংরেজি সংখ্যায় “আমেরিকা: খাব সে ডরাওনে খাব তক আওর আহলে বাররে সাগির কে লিয়ে মাওয়াকে” (امریکہ: خواب سے ڈراؤنے خواب تک اور اہل برصغیر کے لیے مواقع) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এর বাংলা মূল সংস্করণটি লেখক আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যা এখন পুস্তিকা আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান।

সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল- রচনাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়েদা ব্যাপক করুন! আমীন।

আবু যুবাইদা
০৯ জুমাদাল উলা, ১৪৪২ হিজরি
২৪ ডিসেম্বর, ২০২০ ইংরেজি

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পেছনে দুটি প্রধান কারণের কথা বলা হয়। ১৯৮৬ সালে চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরন, এবং ১৯৮৯ সালে খোরাসানে লাল ফৌজের পরাজয়। যেকোন বড় রাষ্ট্র কিংবা শক্তির পতন একটি জটিল প্রক্রিয়া। অনেক পরস্পরসংযুক্ত নিয়ামক (factor) এখানে ভূমিকা রাখে। কিন্তু এমন কিছু ঘটনা থাকে যা পতনের প্রক্রিয়ার সূচনা করে, কিংবা একে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যেখান থেকে ফেরত আসার আর সুযোগ থাকে না। চেরনোবিল এবং খোরাসানে পরাজয় ছিল এমন দুটি ঘটনা। এ ঘটনাগুলোর প্রভাব ছিল ব্যাপক ও বহুমুখী। দুটি ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছিল, যা তাদের অর্থনীতিকে নড়বড়ে অবস্থা থেকে ধসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। একইসাথে এই দুই ঘটনার ফলে ভেঙ্গে পড়েছিল পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অজেয়, পরাক্রমশালী ভাবমূর্তি।

চেরনোবিলের বিস্ফোরণ বিশ্বের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র, কমিউনিস্ট শাসন অকেজো। তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যর্থ, অযোগ্য। এ ঘটনা জনমনে এই ধারণা পাকাপোক্ত করে, সমাজতান্ত্রিক কল্পরাজ্যের যে স্বপ্ন কমিউনিস্টরা দেখাতো তা অন্তসারঃশুন্য। এ আদর্শ ও ব্যবস্থা ব্যর্থ। অন্যদিকে খোরাসানে সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত মুজাহিদিনের কাছে লাল ফৌজের পরাজয় সোভিয়েত শক্তি নিয়ে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে থাকে মুগ্ধতা ও ভয়কে দূর করে দেয়। প্রমাণ হয়ে যায় যে সোভিয়েত সামরিক শক্তি অপরাজেয় নয়।

একই সাথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে। এ বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্বের মুসলিমের কাছে বার্তা পৌছে যায়, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়াই করলে ‘সুপারপাওয়ারকেও’ পরাজিত করা সম্ভব। অতি স্বল্প সম্বল নিয়েও অনেক ছোট দল প্রবল পরাক্রান্ত

প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারে। এ বিজয় বিশ্বজুড়ে জিহাদ আন্দোলনের জাগরণে মৌলিক ভূমিকা রাখে।

আশির দশকের শেষ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া ভাঙ্গনের ও পতনের যে পর্যায় অতিক্রম করছিল, বর্তমানে তেমনই এক সময় অতিক্রম করছে আমেরিকা। শুধু আমেরিকা নয়, বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠা বিশ্বব্যবস্থা আজ ধসে পড়ার দ্বারপ্রান্তে।

হুবালের মূর্তি ক্ষয়ে গেছে। মূহুর্মুহু দুলছে,

আর হুবালের পূজারীরা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে।

আমেরিকার পতনের তিন চিহ্ন

অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা আমেরিকান সাম্রাজ্যের ক্ষয়ে যাওয়া অট্টালিকার বাস্তবতা পৃথিবীর মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছে। আমি মনে করি, চেরনোবিল বিস্ফোরণ এবং খোরাসানে মুজাহিদিনের বিজয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে যে ভূমিকা রেখেছিল, এই ঘটনাগুলো আমেরিকার পতনে একই ধরণের কিংবা আরো ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

ক) খোরাসানে আমেরিকার সামরিক পরাজয়

তিনটি ঘটনার প্রথমটি হল, খোরাসানে মুজাহিদিনের কাছে আমেরিকার পরাজয়। যেভাবে প্রায় তিন দশক আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন খোরাসান থেকে পিছু হটেছিল, ঠিক একইভাবে আজ পিছু হটছে আমেরিকা। ১৯

বছর আগে ঔদ্ধত্যভরে খোরাসানে ছুটে আসা 'সুপারপাওয়ার' আমেরিকা আজ মুজাহিদিনের কাছে পরাজিত হয়ে প্রস্থানের চেষ্টা করছে। এ কারণেই তারা ইমারতে ইসলামিয়ার সাথে আলোচনার টেবিলে আসতে বাধ্য হয়েছে। যদিও আমেরিকা একে চুক্তি বলছে, কিন্তু বাস্তবে এটি হল খোরাসানে আমেরিকার ব্যর্থতাকে 'সম্মানজনক পরাজয়' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা। যে উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে আমেরিকা ছুটে এসেছিল তার কিছুই অর্জন করতে পারেনি। বরং যাদেরকে একসময় তারা সন্ত্রাসী, উগ্রবাদী বলেছে, সেই মুজাহিদিনের সাথে তারা আপস করতে বাধ্য হয়েছে।

এই পরাজয় বিশ্বের মানুষের কাছে প্রমাণ করেছে আমেরিকা নিজেকে যতোই অপরাজেয় বলে প্রমাণের চেষ্টা করুক না কেন, আসলে সে মুজাহিদিনের ঈমান ও ইস্তিকামাতের সামনে টিকে থাকতে অক্ষম। এই পরাজয় পৃথিবীর মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে হলিউড মুভি আর বাস্তবতা এক না। মিডিয়া আর প্রপাগান্ডার মাধ্যমে আমেরিকার যে অজেয় রূপ, যে মূর্তি বিশ্বের মানুষের সামনে গড়ে উঠেছিল – আজ তা ভেঙ্গে গেছে। এবং পুরো বিশ্ব তা মনোযোগের সাথে অবলোকন করেছে।

খ) করোনাভাইরাস এবং আমেরিকান রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতা

দ্বিতীয় ঘটনা হল, কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় আমেরিকার অসহায়ত্ব। করোনাভাইরাসের কারণে সারা বিশ্বজুড়েই জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে তীব্র ধাক্কা লেগেছে আমেরিকাতে। এই বিপর্যয় মোকাবেলায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সুপারপাওয়া বলে বিবেচিত আমেরিকা। চেরনোবিলের বিস্ফোরণ যেভাবে কল্পিত

সোভিয়েত দক্ষতা আর নিয়মতান্ত্রিকতার ব্যাপারে ধারণাগুলোকে ভুল প্রমাণিত করেছিল, ঠিক তেমনিভাবে করোনা মোকাবেলায় আমেরিকান ব্যার্থতা আমেরিকান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কার্যকারিতা, পেশাদারিত্ব আর উন্নতির ব্যাপারে ধারণাগুলোকে ভুল প্রমাণ করেছে। করোনাভাইরাস মোকাবেলায় আমেরিকার ব্যর্থতা শুধু প্রশাসনিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা না। বরং বিশ্বের মানুষ একে দেখছে আমেরিকান ব্যবস্থার (system) ব্যর্থতা হিসেবে।

একইসাথে আমরা দেখছি আমেরিকার অর্থনীতি কতোটা ভঙ্গুর। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে অ্যামেরিকান অর্থনীতি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এপ্রিল থেকে জুন মাসে আমেরিকার অর্থনীতি প্রায় ৩২% সংকুচিত হয়েছে। ২০০৮ এর বৈশ্বিক মন্দার সবচেয়ে খারাপ সময়ে সংকোচন হয়েছিল ৮.৪%। চাকরি হারিয়েছে কয়েক কোটি মানুষ। প্রতি সপ্তাহে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ বেকারত্ব ভাতার জন্য আবেদন করছে। অর্থনীতিবিদরা বলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার অর্থনীতিতে এতো খারাপ সময় আর আসেনি।

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ

"তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর এ বর্ণনা বস্তুত মানবজাতির জন্য এক সতর্কবাণী।" [সূরা আল-মুদাসসির, ৩১]

পুরো পৃথিবীর সামনে আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে, আল্লাহর এক ক্ষুদ্র সৃষ্টির মুখোমুখি হবার সামর্থ্যও তারা রাখে না। সারা বিশ্বজুড়ে বস্তুবাদী মানুষেরা আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকতো, আমেরিকার অনুকরণের চেষ্টা করতো। আজ তাদের অনেকেই খোলাখুলি আমেরিকাকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করছে। আমেরিকান সাম্রাজ্য যেখানে অপরাজেয় হবার বড়াই

করতো সেখানে করোনা ভাইরাস এবং এর প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকার প্রশাসন ও অর্থনীতির শোচনীয় অবস্থা বিশ্বের মানুষের সামনে প্রমাণ করে দিয়েছে, আমেরিকান সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হয়েছে। সামনে অপেক্ষা করছে গভীর, বিপদসংকুল রাত।

গ) দাঙ্গা ও সামাজিক মেরুকরণ

তৃতীয় ঘটনা হল বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন (ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারস/Black Lives Matter) এবং আমেরিকান সমাজ ও রাজনীতিতে এর প্রভাব। বস্তুত আমেরিকান সমাজের বর্ণবাদী চরিত্র এক ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু বর্তমানে যে আন্দোলন চলছে তা কেবল বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন নয়। আদতে এটি হল আমেরিকার সত্ত্বা, ইতিহাস আর পরিচয় নিয়ে বর্তমান আমেরিকার দুই বিপরীত মেরুর মধ্যকার সংঘাত।

এর এক দিকে আছে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে সক্রিয় অংশ হিসেবে কাজ করা উগ্র বামপন্থী ANTIFA (Anti-fascist)। এই আন্দোলন আদর্শিকভাবে বামপন্থী ও উত্তর-আধুনিকতাবাদের (postmodernism) বিভিন্ন তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। এদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনা করা মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষাঙ্গ একটিভিস্ট। সমকামী অধিকার থেকে শুরু করে সব উগ্র সেক্যুলার অবস্থানকে এরা সমর্থন করে। এক কথায় সেকুলার চরমপন্থী। এরা শুধু জর্জ ফ্লয়েডের হত্যা আর পুলিশি আগ্রাসনের বিচার চায় না, বরং এরা মনে করে পুরো আমেরিকান ব্যবস্থা, প্রশাসন, সমাজ, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস – সবকিছু কাঠামোগতভাবে বর্ণবাদী। এই বর্ণবাদ দূর করার উপায় হল বিদ্যমান সব কিছু ভেঙ্গেচুড়ে আবার নতুন করে গড়া।

অন্যদিকে আছে বর্ণবাদী, অস্ত্রধারী, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ইভানজেলিকাল (evangelical) খ্রিস্টানরা। এরা মূলত শ্রমজীবি (working class) মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। ওবামার শাসনামলে ক্ষুব্ধ হয়ে এরা তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত হয়। ট্রাম্পের নির্বাচিত হবার পিছনে এদের বড় ভূমিকা ছিল। ট্রাম্পের শাসনামলে এরা ধীরে ধীরে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন চিন্তা মূলধারার রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই অংশ মনে করে খ্রিষ্টান আমেরিকা আজ এক অস্তিত্বের লড়াইয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে দাড়িয়েছে।

বর্তমানে আমেরিকাতে যে দাঙ্গা চলছে, তার মূল কারণ হল এই দুই মেরুর সংঘাত। এই সংঘাত শুধু ট্রাম্পকে নিয়ে না। জর্জ ফ্লয়েড কিংবা পুলিশি নিষ্ঠুরতা নিয়ে না। বরং এই লড়াই আমেরিকান সমাজ ও রাজনীতির গভীর ফাটলের পরিচায়ক। এই ফাটল দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হচ্ছিল। কোভিড, জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু, অর্থনীতির দুরবস্থা, সামাজিক অস্থিরতা এবং ২০২০ এর নির্বাচনকে সামনে রেখে এটা একেবারে সামনে চলে এসেছে। এই দুই পক্ষ, এই দুই মেরুর মধ্যে কোন আপোস সম্ভব নয়। সঙ্ঘাত অনিবার্য। ক্রমেই দু পক্ষের মেরুকরণ ঘটছে। সংঘাত সহিংস হয়ে উঠছে। দুই পক্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটছে। যতো সময় যাবে এই সংঘাত ততো তীব্র হবে।

জনজীবন ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হবার পরও সরকার ও প্রশাসন এ বিশৃঙ্খলা থামাতে ব্যার্থ হয়েছে। শুধু তাই না, দাঙ্গার মোকাবেলা কীভাবে করা হবে, তা নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার একমত হতে পারছে না। কেন্দ্র আর রাজ্য একে অপরকে দূষছে। আমেরিকার রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট হয়ে গেছে। বড় জাতীয় পলিসি তো দূরের কথা, দাঙ্গা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশি নিষ্ঠুরতার মতো বিষয়

মোকাবেলাতেও রাজনৈতিক দলগুলো এমনকি প্রশাসনের এক অংশ আরেক অংশের সাথে একমত হতে পারছে না।

পৃথিবীর মানুষ দেখছে বাকি দুনিয়াকে সভ্যতার শিক্ষা দেয়া, উদারতা আর শান্তির গল্প বলা, অধিকার আর সাম্যের কথা বলা আমেরিকার আজ কী অবস্থা। আমেরিকান স্বপ্ন এখন পরিণত হয়েছে আমেরিকান দুঃস্বপ্নে। আর পুরো দুনিয়ার মানুষ তা দেখছে।

এ প্রবন্ধের শুরুতে বলেছিলাম, যেকোন বড় রাষ্ট্র কিংবা শক্তির পতনের পেছনে অনেক পরস্পরসংযুক্ত নিয়ামক (factor) ভূমিকা রাখে। কাজেই এ তিনটি কারণেই যে আমেরিকার পতন ঘটবে তা আমি দাবি করছি না। কিন্তু আমি মনে করি, এই ঘটনাগুলো আমেরিকার পতনের প্রক্রিয়াকে আরো দ্রুত করবে এবং একে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যেখান থেকে ফেরত আসার আর সুযোগ থাকে না।

মুজাহিদিনের কৌশলের সফলতা

মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে সামরিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে আমেরিকা রাষ্ট্রের অসহায়ত্ব, দেউলিয়াত্ব এই তিন ঘটনার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হয়ে গেছে। বস্তুত, এটি আল্লাহই প্রকাশ করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন।

এই ক্রমধারার সূচনা যে খোরাসানের মুজাহিদনের কাছে আমেরিকার পরাজয় স্বীকারের মাধ্যমে শুরু হয়েছে তাও কাকতালীয় নয়। বরং এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সামনে মহান আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে জিহাদের রাস্তায় অটল থাকলে আল্লাহ

তাঁর বান্দাদের নিরাশ করবেন না। তাদের অভাবনীয় উৎস থেকে নুসরত করবেন, সাফল্য দিবেন। বান্দার কাজ শুধু সাধ্যমত চেষ্টা করা। আরশের উপরে যিনি আছেন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে, কীভাবে বান্দাকে নুসরত করেন, সাফল্য দেন তা মানবীয় বুদ্ধি আর যুক্তির বাইরে।

বস্তুত আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদে তিনটি মূল উদ্দেশ্যের কথা শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছিলেন-

ক) আমেরিকাকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধে জড়িয়ে দুর্বল করে ফেলা। আমেরিকান সামরিক ক্ষমতার অতি-প্রসারণ (strategic overreach) ঘটানো যাতে আমেরিকা মুসলিম বিশ্বে সামরিক আগ্রাসনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

খ) আমেরিকান অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দেয়া।

গ) আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট করে দেয়া।

আলহামদুলিল্লাহ, এই সবগুলো উদ্দেশ্য আজ অর্জিত হয়েছে। এবং এর জলজ্যান্ত প্রমাণ আমাদের সামনেই রয়েছে।

উপসংহার

শুধু অ্যামেরিকান সাম্রাজ্য না, আমি মনে করি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠা বিশ্বব্যবস্থা আজ এমন এক পর্যায়ে পৌছে গেছে যাকে ইবনে খালদুন, টয়েনবি, কেনেডি, জন গ্লাবসহ অনেক মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিক অবধারিত পতনের পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই পতনের প্রক্রিয়া দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবেই তা শুরু হয়ে

গেছে। খোদ পশ্চিমের অনেক গবেষকের কথাতেও এই স্বীকারোক্তি আজ ফুটে উঠছে।

আমেরিকার আসন্ন পতনের বিভিন্ন প্রভাব এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কাফের-মুশরিকরাও লক্ষ্য করেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে আমেরিকা আর বিশ্বজুড়ে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম নয়। আমেরিকার একাধিপত্য খর্ব হওয়ার কারণে সে এখন আর আগের মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক সংঘাতে জড়াতে চাচ্ছে না। উলটো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজেদের সামরিক উপস্থিতি কমিয়ে আনছে। অন্যদিকে এই শূন্যস্থান পূরণে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি এগিয়ে আসছে। তারা নিজেদের সক্রিয়তা ও উপস্থিতি বাড়াচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের নিয়ন্ত্রন আমেরিকা অনেকটাই ভারতের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সে আর এ অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। আমেরিকার প্রস্থানের পর এ অঞ্চলে ইসলাম কায়েমের পথে এখন মূল শত্রু হল মালাউন হিন্দুরা। হিন্দুত্ববাদী শক্তিই এখন হবে মুজাহিদিনের মূল টার্গেট। এই শত্রুর আছে তাওহিদ ও মুসলিমদের সাথে বিদ্বেষের হাজার বছরের রক্তাক্ত ইতিহাস। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেয়া সুসংবাদকে মাথায় রেখে উপমহাদেশের মুসলিমদের উচিৎ এ অঞ্চলে মুসলিমদের ঐতিহাসিক শত্রু, গো-পূজারী হিন্দুদের দিকে মনোযোগ দেয়া, নিজেদের সর্বশক্তি এই শত্রুর উপর প্রয়োগ করা। শত্রুকে কয়েক ফ্রন্টে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। বিশেষ করে ইযযত ও আত্মত্যাগের ভূমি কাশ্মীরের জিহাদকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পুরো মুসলিম উম্মাহর উচিৎ কাশ্মীরের ঘটনাবলীর দিকে মনোযোগী হওয়া।

আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ রহমতে আমরা ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি। তিন দশকের অক্লান্ত পরিশ্রম, আত্মত্যাগ আর রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর বৈশ্বিক জিহাদ এখন প্রবেশ করছে নতুন এক পর্যায়ে। আল্লাহর ইচ্ছায় ইতিহাসের গতিপথকে বদলে দেয়ার সুযোগ আমাদের

হাতের নাগালে। তাওহীদ ও জিহাদের পথকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে, মুজাহিদিন নেতৃবৃন্দের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী, ইস্তিকামাতের সাথে যদি এগিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায়, বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন ময়দানে মুজাহিদিনের অগ্রগতি এবং তামকিন অর্জন সম্ভব হবে। বিশেষ করে উপমহাদেশের মুসলিম ও মুসলিম যুবকদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ হাতছানি দিচ্ছে। খোরাসানের বিজয়ের পর এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আল্লাহর ইচ্ছায় মুজাহিদিন যে কোন শত্রুকে পরাজিত করতে সম্ভব। যেখানে আমেরিকাকে পরাজিত করা সম্ভব সেখানে মালাউন হিন্দুদেরও পরাজিত করা সম্ভব। ময়দান প্রস্তুত হয়ে গেছে, খেলা শুরু হয়ে গেছে, এখন আর মাঠের বাইরে দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকার সুযোগ নেই।